সহিষ্ণুতা নয়, সমানাধিকার চাই

গণতন্ত্রের একটা মূল ভিত্তি হল বহুত্ববাদ। একে অপরকে বোঝা, জানা, আদানপ্রদান, আলাপচারিতা এবং ভিন্ন মত ও পথকে সম্মান দেওয়ার প্রক্রিয়া হল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এখানে সহিষ্ণুতা বা সহ্য করার প্রশ্ন আসে কেন? আলোচনা করলেন **মইদুল ইসলাম**।

গত কয়েক বছরে ভারত ও বাংলাদেশে কিছু ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক হিংসা আর কয়েকটা ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদী বা আততায়ীর আক্রমণে কিছু মানুষের প্রাণ গেছে। এমতাবস্থায় শান্তি রক্ষার্থে অনেকেই 'সহিষ্ণুতা' নামক শব্দটি বারবার ব্যবহার করেছেন এবং যেনতেন প্রকারেণ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে 'সহিষ্ণুতা' আসলে কত উত্তম একটা ভাবধারা। আমাদের দেশ ভারত ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে যে ঘটনাগুলো ঘটছে তা মানুষের বেঁচে থাকার, স্বাধীন মতপ্রকাশ ও নিজ মতে জীবনযাপন করার 'মৌলিক অধিকারে'র উপর হস্তক্ষেপ। এগুলো একটা পরিকল্পিত রাজনৈতিক ছকের অংশ বিশেষ। সেই রাজনৈতিক ছক বিরোধী মতের টুঁটি চাপার ছক। ওই ঘটনাগুলো সহিষ্ণুতা/অসহিষ্ণুতার বিতর্কের বাইরে। সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে, তাবড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদের অধিকারী মানুষজনও 'অসহিষ্ণু'/'সহিষ্ণু' শব্দগুলোর বারংবার ব্যবহার করেছেন। অথচ 'সহিষ্ণু' ও 'অসহিষ্ণু' শব্দ দুটি ভারতের সংবিধানে নেই। একথা জানতে গেলে কোনও সংবিধান বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কেউ ইংরেজি ভাষায় লেখা ভারতের সংবিধানের একটা পিডিএফ ফাইল ডাইনলোড করে 'সহিষ্ণু' (tolerance) ও 'অসহিষ্ণু' (intolerance) শব্দদুটি খুঁজতে পারেন। তন্ন তন্ন করে আপনি নিজে খুঁজলেও পাবেন না। আর সহজে কম্পিউটার বলবে শব্দদুটো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে ন্যায়-বিচার, স্বাধীনতা, সমতা, গণতন্ত্র, মর্যাদা, অধিকার, শান্তি, প্রগতি, বন্টন, কল্যাণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ। এর কারণও রয়েছে। ভারতের সংবিধান প্রণেতারা বোকা ছিলেন না। ইংরেজিতে লেখা ভারতের সংবিধানে তাঁরা 'টলারেন্স' (সহিষ্ণুতা) ও 'ইনটলারেন্স' (অসহিষ্ণুতা) শব্দগুলো কেন ব্যবহার করেননি? তাঁরা মনে করেছেন যে সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার সমান। সেখানে সহ্য করা বা না করার প্রশ্ন উঠবে না। বরং একে অপরের সমানাধিকারকে মেনে নিতে হবে। সেখানে একে অপরের সমানাধিকারকে স্বীকৃতির প্রশ্ন থাকে। একে অপরের প্রতি সহনশীলতার প্রশ্ন থাকে না।

'সহিষ্ণুতা' অর্থ দাঁড়ায় কেউ অন্য কাউকে সহ্য করছে। 'সহিষ্ণু' শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হলেও সেটা একটা সমস্যাপূর্ণ শব্দ যা দিয়ে সংখ্যাগুরুবাদ পরোক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়। সহিষ্ণুতা হল 'সহিষ্ণু' ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর 'অপরকে' সহ্য করার নৈতিক মান। সেখানে সহিষ্ণু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাপদণ্ডে বিচার করা হয় অপরকে (যাকে সহ্য করা হচ্ছে)। সেখানে সহিষ্ণু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মুখ্য আর সহিষ্ণুত ব্যক্তি/গোষ্ঠী গৌণ। আর একটু গভীরে গিয়ে বলা যায় যে 'বিভিন্ন ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত, লিঙ্গগত সংখ্যালঘুকে সহ্য করছি এই তাদের ভাগ্নি, আমাদের মহানুভবতা' 'ওদের মত, পথ, জীবনচর্যাকে সহ্য করতে নাও তো পারতাম!' তাই সহিষ্ণুতার পক্ষে উপদেশ ও বক্তৃতা হল সহিষ্ণু ও সহিষ্ণুদের মধ্যে এক অসম বড় ভাই ছোট ভাই জাতীয় সম্পর্ক। অন্যদিকে সম্মান, সম্ভ্রম বা মর্যাদা হল সমতার সম্পর্ক।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার চিন্তা বহু দশক ধরে বিভিন্ন প্রকারের সংখ্যাগুরুবাদের ভাষায় কথা বলছে। সেই সংখ্যাগুরুবাদের মানদন্ডে পাশ করলে 'সহিষ্ণু' আর ফেল করলে 'অসহিষ্ণু'। আমাদের অজান্তে, জনমানসে এবং আমাদের অন্তরে সংখ্যাগুরুবাদের রঙে রঙিন, 'সহিষ্ণুতা' শব্দটি আধিপত্য বিস্তার করেছে। ভারত ও পৃথিবীর অনেক জায়গায় যে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী হিংসার ঘটনা ঘটছে তা মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে খর্ব করার প্রশ্ন আর অনেক সময় ন্যায়বিচার, সমতা, মর্যাদা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারকে অস্বীকৃতির প্রশ্ন। ওগুলো অসহিষ্ণুতার প্রশ্ন নয়। অমর্ত্য সেনের ভাষায় 'তার্কিক' ঐতিহ্যকে সামনে রেখে ভারতে মতবিরোধ ও মতানৈক্য থাকবে। হিংসা ছড়ানোর মতো বেআইনি অপরাধ করলে আইন মেনে শাস্তি হবে। অন্য মত ও জীবনচর্যা দেখে খারাপ লাগলে বা মন থেকে মেনে নিতে না পারলে নিন্দা করুন, গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ করুন। কিন্তু অন্যের উপর হিংসাত্মক আক্রমণ কেন করা হবে? এমতাবস্থায় সহনাগরিককে 'সহ্য' করার প্রশ্ন কোথা থেকে উঠছে? স্বাধীন ভারতের সংবিধান কর্তৃক যে অধিকার প্রত্যেক নাগরিককে দেওয়া হয়েছে সেটাই সকলকে মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে 'সহিষ্ণুতা/অসহিষ্ণুতা' নামক শব্দগুলো ব্যবহার একমাত্র একটা দুর্বল রাষ্ট্র করে যে সংখ্যাগুরুবাদের চাপে পড়ে নাগরিক অধিকার রক্ষা করতে এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে অপারগ। 'সহিষ্ণুতার' পরিবর্তে 'সমভাব' (equal respect) ও 'সমন্বয়বাদ' (syncretism) শব্দ দুটি বরং যথার্থ। বিলেত থেকে আমদানি করা উদারনৈতিক 'tolerance' এর ধারণার পরিবর্তে ভারতের সংবিধানে যে 'composite culture' এর কথা বলা আছে সেইদিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার।

ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর উদারবাদের (liberalism) দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেখানে 'টলারেশান আইন' (Tolerance Act, 1689) বলবৎ হয়। আসলে পাশ্চাত্যের উদারবাদের মধ্যে একদিকে সমানাধিকার আর অন্যদিকে সহিষ্ণুতার নামে নাগরিকদের মধ্যে এক অসম সম্পর্কের দ্বন্দ্ব রয়েছে। বামপন্থীরা কিন্তু 'সহিষ্ণুতার' কথা বিশেষ বলতেন না। কারণ সে ভাষা আসলে উদারবাদের ভাষা যা পুঁজিবাদি শোষণকে ঢেকে রাখার ও প্রলেপ লাগানোর ভাষা। বরং ঐতিহাসিক ভাবে বামপন্থীরা বরাবর 'দাবির' (demands) ভাষায়

কথা বলতে সচ্ছন্দ বোধ করেন। বামপন্থী রাজনীতি, উদারবাদী অধিকারের (liberal rights) পরিবর্তে দাবি-দাওয়াকে সামনে রেখে রাজনীতি করার প্রক্রিয়া। সেখানে সহিষ্ণুতার ভাষায় কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। এই বিষয়ে নব্য বামপন্থী ঘরানার সমাজতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক দার্শনিক, হার্বার্ট মার্কুসে 'সহিষ্ণুতা' শব্দটি বেশ সমালোচনাই করেছিলেন। তাঁর লেখা 'রিপ্রেসিভ টলারেন্সে' (Repressive Tolerance) তিনি দেখিয়েছেন যে কীভাবে পশ্চিমের উদারনৈতিক পুঁজিবাদী সমাজে, 'সহিষ্ণুতা' আসলে দক্ষিণপন্থী সংখ্যাগুরুর মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে সদা ব্যস্ত। এক্ষেত্রে সহিষ্ণুতার নামে চলে সংখ্যাগুরুর ঠান্ডা নিস্তেজ হিংসা (tyranny of the majority) যা অবলীলাক্রমে সংখ্যালঘুর উপরে চাপানো হয়। মার্কুসে এক ক্ষুরধার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক পুঁজিবাদী সমাজে, সংখ্যালঘুর প্রতি যে নামমাত্র 'সহিষ্ণুতা' দেখানো হয় সেটা বিভ্রান্তিমূলক ও ভাঁওতাবাজি। কারণ সেখানে সংখ্যালঘুর মত ও পথকে আসলে গণ্য করা হয় না। কিন্তু নাম কা ওয়াস্তে 'সহিষ্ণুতার' কথা বলে ও 'অসহিষ্ণুতা'-র প্রসঙ্গ তুলে উদারবাদ এক ধরনের ভন্ডামি ও ভণিতা করে।

এই ভণিতা পাশ্চাত্যের তথাকথিত বহুসংস্কৃতিবাদের (multiculturalism) মধ্যেও দেখা যায়। এক্ষেত্রে বামপন্থী দার্শনিক, স্লাভোজ জিজেক দেখিয়েছেন যে বহুজাতীয় পুঁজিবাদী প্রেক্ষাপটে, বহুসংস্কৃতিবাদ একদিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে সস্তা শ্রমিককে পাশ্চাত্যে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে আর অন্যদিকে পাশ্চাত্যের নগরগুলোয় শ্বেতবর্ণ ও অশ্বেতবর্ণের (কৃষ্ণাঙ্গ, খয়েরি ও হলুদ মানুষ বা কালার্ড মানুষ) বিভাজনে বিভাজিত ঘেটো তৈরি হবে। অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের সস্তা শ্রমিক পশ্চিমা অত্যাধুনিক ধনতান্ত্রিক দেশে অবশ্যই আসবে কিন্তু ওদেশের সাদা চামড়ার নাগরিকদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকবে না। তারা কিছু বিশেষ অঞ্চলে থাকবে এবং পশ্চিমা দেশের একটু দূর থেকে করা নিপুণ বর্ণবৈষম্যের শিকার হবে। এক্ষেত্রে সাদা চামড়ার পশ্চিমা নাগরিক তৃতীয় বিশ্বের অশ্বেতবর্ণ মানুষের রীতি নীতিকে একটু দূর থেকে সহ্য করবে। অনেকটা যেন দয়া করা মতো। শ্বেতবর্ণ নাগরিক জানে যে অশ্বেতবর্ণ মানুষদের ছাড়া তাদের চলবে না। কারণ এই অশ্বেতবর্ণ মানুষজন ন্যানি অথবা আয়া হয়ে সাদাদের সন্তান দেখাশোনা করে, জমাদারি করে, বাগানের মালির কাজ করে, হোটেল ও দোকানে কাজ করে। কিন্তু সাদা বাবুরা এই অশ্বেতবর্ণ মানুষদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে বিশেষ একটা মেলামেশা করে না এবং অনেক ক্ষেত্রে একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলে। তাই পাশ্চাত্যে বহুসংস্কৃতিবাদ থাকা সত্ত্বেও অশ্বেতবর্ণ মানুষজনের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের যেন কেমন একটা নিরুত্তাপ ব্যবহার, একধরনের দূরত্ব মার্কা বর্ণবিদ্বেষ।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের উদারবাদের অনুকরণ করতে গিয়ে একদিকে উদারতা আর অন্যদিকে সংখ্যাগুরুতন্ত্রের দ্বন্দ্বও সমানে চলে এসেছে। গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুর অধিকার স্বীকৃত। কোনও দেশে গণতন্ত্র কত সফল— সেটা সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে স্পষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারা। প্রতিবাদ করতে পারা। মতানৈক্য প্রকাশের সুযোগ থাকা। মতবিরোধ তুলে ধরার সুযোগ থাকা। গণতন্ত্রে সবাই একমত হবেন না। তাই গণতন্ত্রের একটা মূল ভিত্তি হল বহুত্ববাদ। তা না হলে গণতন্ত্রের পরিসর বাড়বে না। একে অপরকে বোঝা, জানা, আদানপ্রদান, আলাপচারিতা এবং ভিন্ন মত ও পথকে সম্মান দেওয়ার প্রক্রিয়া হল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এখানে সহিষ্ণুতা বা সহ্য করার প্রশ্ন আসে কেন? গণতন্ত্র তো সংখ্যাতন্ত্র নয়। ভোট হচ্ছে গণতন্ত্রের একটা উপায়স্বরূপ দিক। প্রকৃত বা প্রায় সম্পূর্ণ দিক নয়। ভোট গণতন্ত্রে অপরিহার্য। ওটা থাকতেই হবে। কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে প্রতিবাদের পরিসর বাড়ানো ও ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রাচীন ভারতে সম্রাট অশোক, বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার পর অন্য মত ও পথকে সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কয়েকটা বিশেষ নীতির কথা বলেছিলেন। সেই নীতিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বহুত্ববাদকে গ্রহণ করার নীতি ও নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সহাবস্থানের নীতি। মধ্যযুগে সম্রাট আকবর, দিন-ই-ইলাহী নামে যে বিশেষ ধর্মমতের উদ্ভাবন করেছিলেন, তার মূলে ছিল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা এবং প্রত্যেক ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার কথা। একটু খেয়াল করে অশোক ও আকবরের মতকে যাচাই করলে বোঝা যাবে যে দুজনেই বিভিন্ন মত ও পথের মানুষদের মধ্যে সমভাব ও সমদৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। ঠিক সহিষ্ণুতার বাণী নিয়ে কচকচানি করেননি। সহিষ্ণুতার আড়ালে আসলে এক চরম ঔদ্ধত্ব ও উন্নাসিকতা নিয়ে অপরকে দয়া করার মতো বা অনুগ্রহ করার মতো ব্যবহার ফুটে ওঠে। যেন অন্যের প্রতি সহনশীল হয়ে অপরকে উদ্ধার করছি, অন্যকে কৃপা করছি। ভাবখানা এমন যেন সেই কৃপা চাইলে নাই করতে পারতাম। ভাবখানা এমন যেন দেশটা তো আসলে সংখ্যাগুরু মানুষের। তাই বিভিন্ন সংখ্যালঘুদের প্রতি একটু বড় হৃদয় নিয়ে সংখ্যাগুরু, সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছে। আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা একটি আধুনিক সংবিধানের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তাই ভারতে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর প্রতিকারে প্রথম গন্তব্য হওয়া উচিত ভারতের সংবিধান। তাই আবার মনে করিয়ে দেওয়া যে ভারতের সংবিধানে সহিষ্ণুতা ও অসহিষ্ণুতা শব্দযুগল একবারের জন্যও উচ্চারিত হয়নি। ভারতের প্রাচীন, মধ্যযুগ ও উপনিবেশবাদের সময়ের আচার, কৃষ্টি, সংস্কৃতির কাছ থেকে যদিও আমরা অনেককিছু শিখতে পারি কিন্তু সেগুলো আধুনিক ভারতের সংবিধানে বিকল্প হতে পারে না। চারদিকে যখন সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদী হিংসা ছড়িয়ে মানুষের ঐক্য ভাঙার চেষ্টা হয় তখন বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবি, চাহিদা ও মৌলিক অধিকারের কথা বলাই হল প্রগতিশীল রাজনীতির একমাত্র কর্তব্য। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের নামে সন্ত্রাসবাদ যা 'শত্রু' মারার নামে অবধারিত ভাবে অনেক নিরপরাধ ও নির্দোষ মানুষকে খুন করে, তা নিপাত যাক। মানুষের মধ্যে বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তি নিপাত যাক। 'সহিষ্ণুতার' নামে বড় ভাই, ছোট ভাই করা অসম সম্পর্কের ভাষা বর্জিত হোক। শান্তি, স্বাধীনতা, সমতা, মর্যাদা, ন্যায়, স্বীকৃতি, অধিকার, বন্টন, কল্যাণ, প্রগতি ও গণতন্ত্রের ভাষা বেঁচে থাক। ❑